ইংরেজ শাসন – ২ (১৯০৫ থেকে ১৯৪৭)

Siddhartha

লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১৯১০)

- মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯) অনুযায়ী মুসলিমরা পৃথক নির্বাচনের অধিকার লাভ করে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬)

- বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।
- রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর।
- ঢাবি প্রতিষ্ঠার জন্য 'নাথান কমিশন' গঠন।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন

মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার (১৯১৯)

- ভারত সরকার আইন, ১৯১৯-কে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারও বলা হয়, কারণ ১৯১৭ সালে এডউইন মন্টেগুকে ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট করা হয়েছিল। এডউইন মন্টেগু ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসিত একটি দেশ গঠনের জন্য ধীরে ধীরে বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি এই প্রস্তাব দেন।

Reading

লর্ড রিডিং (১৯২১-১৯২৬)

ঢাবি প্রতিষ্ঠা করেন

১৩

লর্ড লিনলিথগো (১৯৩৬-১৯৪৩)

- প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৩৭)
- পশুর জাত উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন

লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-১৯৪৭)

তাঁর আমলে ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় পঞ্চাশের মন্বন্তর)

গণকণ্ঠ

মেহনতী মানুষের দৈনিক মুখপত্র

বন্যার দরুন শস্যহানি, ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশ আমদানী,
বণ্টনে অব্যবস্থা, মজুতদারী ও চোরাচালানের পরিণতি

খাদ্য সংকট তীব্রতর হচ্ছে

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর) নিয়ে

- চলচ্চিত্র: আকালের সন্ধানে (পরিচালক: মৃণাল সেন)
- চলচ্চিত্র: অশনি সংকেত (পরিচালক: সত্যজিত রায়)
- চিত্রকর্ম: ম্যাডোনা-৪৩ (জয়নুল আবেদীন)
- নাটক: নেমেসিস (নুরুল মোমেন)
- নাটক: ছেঁড়া তার (তুলসী লাহিড়ী)
- বই: চার্চিলস সিক্রেট ওয়ার (মধুশ্রী মুখার্জী)

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চলচ্চিত্র

ম্যাডোনা-৪৩: (জয়নুল আবেদীন) ~ তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চিত্রকর্ম

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা নাটক

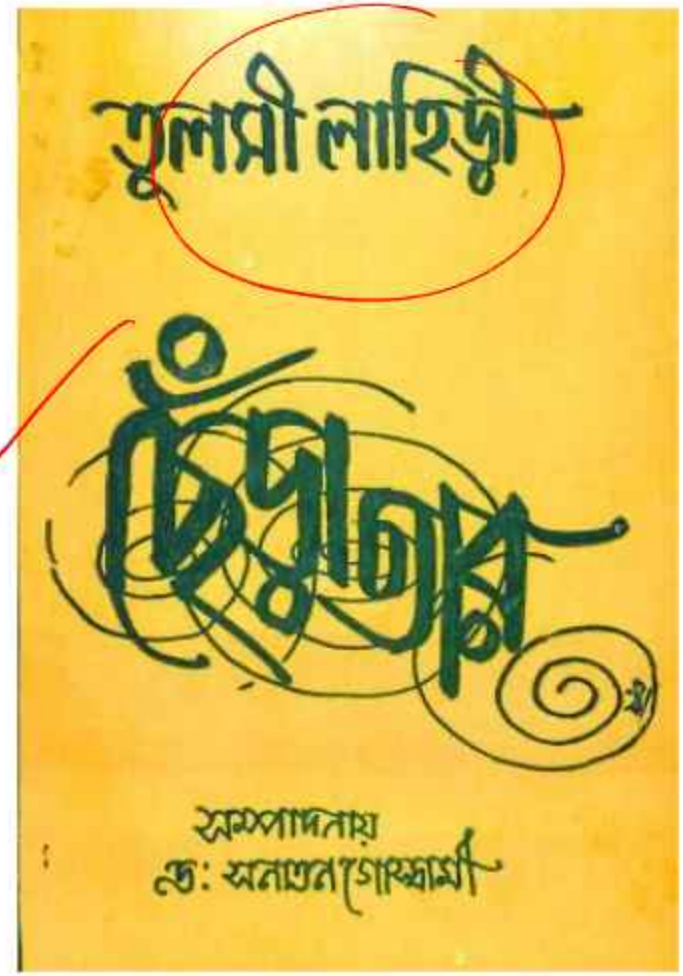

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)

- উপমহাদেশের শেষ ভাইসরয় হিসেবে ছিলেন।
- স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল

স্বাধীনতার পথে

ব্রিটিশ পিরিয়ডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

- ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ
- ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন - মজনু শাহ
- সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন - ভবানী পাঠক
- ভবানী পাঠকের সহযোগী - দেবী চৌধুরানী

চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ: (১৭৭৬-১৭৮৭)

- নেতৃত্ব দেন: জোয়ান বক্স খাঁ
- বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা উড়ানো নেতা

বাঁশেরকেল্লা বিদ্রোহ

- তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া থেকে বিদ্রোহ করেন।
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী। তিনি নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন।
- মেজর স্কটের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী ১৮৩১ সালে তিতুমীরকে পরাজিত করে এবং কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন

- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন – হাজী শরীয়তুল্লাহ।
- হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন- মাদারীপুরে
- ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়- ১৮১৮ সালে
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ছিল- ফরিদপুর।
- তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হাব' বা বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র দুদু মিয়া।
- দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেন।

দুদুমিয়া

“জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী”

নীল বিদ্রোহ

- বাংলায় নীলচাষ শুরু হয় ১৭৭০-১৭৮০ সালের মধ্যে।
- নীল বিদ্রোহ তুঙ্গে ওঠে- ১৮৬০ সালে।
- নীল বিদ্রোহের প্রবাদ পুরুষ ছিল- সর্দার বিশ্বনাথ।
- ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠন করে নীলচাষকে ইচ্ছাধীন বলে ঘোষণা করে।
- নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে— ১৮৬২ সালে।

নীলদর্পণ

- নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়- নীলদর্পণ।
- 'নীলদর্পণ' গ্রন্থের রচয়িতা - দীনবন্ধু মিত্র।
- "নীল দর্পণ" নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় – ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে।
- "নীল দর্পণ" নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতো ছুড়েন— বিদ্যাসাগর।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন—"Indigo Planting Mirror" নামে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

- ১৯২২ সালে ব্রিটিশ পুলিশ হত্যার জন্য 'লালবাংলা' প্রচারপত্র বিলি করা হয়।
- ১৯২৪ সালে ইংরেজ সরকার 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' জারি করে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে।

রাসবিহারী বসু

- রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫) ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একজন বিপ্লবী নেতা এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সংগঠক। দিল্লিতে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপর এক ব্যর্থ বোমা হামলায় নেতৃত্ব দানের কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারের চেষ্টা করে। তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার নজর এড়াতে সক্ষম হন এবং ১৯২৩ সালে জাপানে পালিয়ে যান।
- তাঁরই তৎপরতায় জাপানি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পাশে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন যোগায়।

বাঘা যতীন

- বাঘা যতীন (১৮৭৯-১৯১৫) বিপ্লবী ও ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। তাঁর প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ঝিনাইদহ জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোন অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াই খালি হাতে বাঘ হত্যা করার পর তাঁকে বাঘা যতীন নামে অভিহিত করা হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে অস্ত্র এনে গঠন করেন 'জার্মান প্লট'।

সূর্যকুমার সেন (মাস্টারদা)

- 'চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী' (পরে চিটাগাং রিপাবলিকান আর্মি)
- ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের ২টি সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন।
- ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দিয়ে মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

- মাস্টারদার ছাত্রী।
- লীলা নাগের 'দীপালি সঙ্ঘের' অন্তর্ভুক্ত শ্রী সংঘের সদস্য ছিলেন।
- ১৯৩২ সালে মাস্টারদা, প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে চট্টগ্রামের 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের জন্য মনোনীত করা হয়।
- সেখানে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সুনীতি চৌধুরী: সর্বকনিষ্ঠ নারী বিপ্লবী

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পাশাপাশি কোলকাতায় যুগান্তর দলও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই বছর ডিসেম্বরে এক অভিযানে কোলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন নিহত হন। এর আগে বিনয় বসুর হাতে নিহত হন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার লোম্যান। এই বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে জড়িত বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করেন এবং দীনেশের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত বীণা দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মেদিনীপুরে পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ

- সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা। এই আন্দোলন পরিচালিত হতো গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছুসংখ্যক শিক্ষিত সচেতন যুবক। নিরাপত্তার কারণে সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গোপনে পরিচালিত হতো। সাধারণ জনগণের এ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। সাধারণ মানুষের কাছে সশস্ত্র আক্রমণ, বোমাবাজি, হত্যাকাণ্ড— সবই ছিল আতঙ্ক আর ভয়ের কারণ। ফলে সাধারণ মানুষ ছিল এদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪)

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং সেভার্স চুক্তির (আগস্ট ১০, ১৯২০) অধীনে তুরস্কের ভূখন্ড ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ায় ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণে তুর্কি খিলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তিগুলির হাত থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়।
- নেতৃত্ব দেন- মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমূখ।
- খিলাফত আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে একতা দৃঢ় করে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দেয়।

রাওলাট আইন/কালো আইন (পাস হয় ১৯১৯ সালে)

রাওলাট আইন পাস হয় –ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ভারতে সরকার বিরোধী আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এই আইন করা হয়েছিল। এই আইনে বিভিন্ন ধারা ছিলো যেগুলোর মধ্যে সরকারবিরোধী প্রচারকার্য দণ্ডনীয় ঘোষণা, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার, বাড়ি তল্লাশি, সন্দেহভাজনকে সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া বিচারকার্য, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, মুক্তির জন্য অর্থদণ্ড, আপিলের নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯)

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯)

- রাওলাট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে – জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতীয় নাগরিকরা একত্রিত হয়।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল– পাঞ্জাবের অমৃতসরে (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে)।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে: জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেন– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৯ সাল)।

গান্ধীর অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ'

- সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামকে গান্ধীজি "সত্যাগ্রহ" নামে আখ্যা দেন। তাঁর মতে, সত্যাগ্রহ হলো আত্মার শক্তি বা প্রেমের শক্তি। গান্ধীজী মনে করেন, সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে অহিংস আন্দোলন করবে এবং সে কখনোই হিংস্র হয়ে উঠবে না। মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করে অত্যাচারীর হৃদয় পরিবর্তন ঘটানোই বা তার অন্তরের শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটানোই হলো সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য। এ প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় সফলতা পেয়েছিলেন। ১৯১৭ সাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত কয়েকটা পর্যায়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন জারি ছিল।
- ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিলে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড এবং ১৯১৯ সালের রাওলাট অ্যাক্টকে সরকারি নির্যাতনের প্রমাণরূপে চিহ্নিত করে এর প্রতিবাদে অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ' জোরদার করেন।

গান্ধীর অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'সত্যাগ্রহ'

- তাঁর আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সদস্য হন।
- সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে (১৯২০) গান্ধী 'স্বরাজ' কর্মসূচিকে খিলাফত আন্দোলনের দাবির সঙ্গে যুক্ত করেন এবং উভয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসহযোগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
- ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলে।

অসহযোগ আন্দোলন

- আন্দোলন চলে ১৯২০-১৯২২ পর্যন্ত।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

- ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা চিত্তরঞ্জন দাস (সি. আর. দাস) ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সি. আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ পার্টি। সি. আর. দাস হন এ দলের সভাপতি। মতিলাল নেহরু হন অন্যতম সম্পাদক।
- স্বরাজ দলের বিরোধীরা অসহযোগ আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে আইন বয়কট করার সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। অন্যদিকে স্বরাজ দল গঠনের পরপর বাংলার অনেক বিপ্লবী— সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এতে যোগদান করেন।

বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

- স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করে এই চুক্তি করেন।
- এটি **'সি আর দাশ ফর্মুলা'** নামেও পরিচিত।
- স্বাক্ষর: ১৯২৩
- পক্ষ: স্বরাজ পার্টি ও মুসলমানদের একাংশ

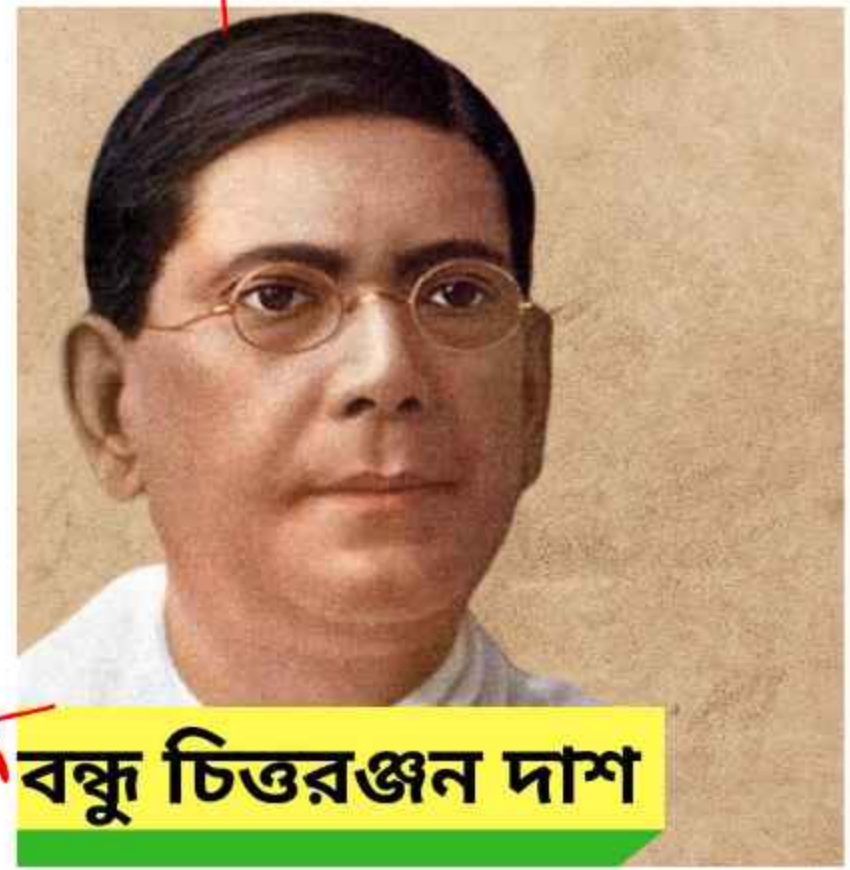

বেঙ্গল প্যাক্টের অবসান

- বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের দলিল ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি। এই চুক্তির কারণেই মুসলমানের আস্থা অর্জন করে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়। অপরদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোলকাতার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং মুসলমানরা কর্পোরেশনে চাকরি লাভে সক্ষম হয়। বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সি. আর. দাসের এই পদক্ষেপ যেমন বাস্তবধর্মী ছিল তেমন ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে থাকতেই হিন্দু পত্রিকাগুলো, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ, গান্ধীজির সমর্থক কংগ্রেস দল ও স্বরাজ দলবিরোধী হিন্দুরা 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর তীব্র বিরোধিতা করে।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০)

Dominion

১৯২৯ সালে ভাইসরয় আরউইন কর্তৃক ঘোষিত ডোমিনিয়নের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে এই আন্দোলন করেন।

সাইমন কমিশন

- লর্ড আরউইন এর সময়ে উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য গঠিত কমিশনের নাম হলো সাইমন কমিশন (১৯২৭ সালে)। এটি সাদা কমিশন নামে পরিচিত। এর সদস্য ছিল ৮ জন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। কাজী নজরুল ইসলাম 'সাইমন কমিশন রিপোর্ট' নামে ব্যাঙ্গাত্মক একটি কবিতা লিখেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫

- ১৯২৬ সালে ঢাকা ও কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হলে ব্রিটিশ সরকার একটি ভারত শাসন আইন প্রণয়নের জন্য ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করে।
- পরবর্তীতে সাইমন কমিশন, নেহরু রিপোর্ট ও চৌদ্দ দফা নিয়ে ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি গোলটেবিল বৈঠক।
- মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, সাইমন কমিশন ও ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে **১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় ভারত শাসন আইন**।

ভারত শাসন আইন

- ভারত শাসন আইন পাস হয়- ১৯৩৫ সালে
- ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়— ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯৩৫ সালে
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন- ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৩৭ সালে

ভারত শাসন আইনের ফলাফল

- বার্মা (মিয়ানমার) উপমহাদেশ থেকে পৃথক হয় (কার্যকর: ১৯৩৭)
- বিহার ও উড়িষ্যা নামে নতুন ২টি প্রদেশ গঠিত হয়
- উপমহাদেশে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায়

ভারত শাসন আইনের ফলাফল

কেন্দ্রীয় আইনসভা হয় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট

- (ক) রাষ্ট্রীয় সভা (Council of State) [উচ্চকক্ষের নাম]
- (খ) ব্যবস্থাপক/যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা (Federal Assembly) [নিম্ন কক্ষের নাম]

কৃষক প্রজা পার্টি

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৩৬
- প্রতিষ্ঠাতা- শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

কৃষক প্রজা পার্টি-

প্রতীক (হুক্কা)

কৃষক প্রজা পার্টি

শ্লোগান: ডাল ভাত

১৯৩৭ সালের নির্বাচনী স্লোগান

লাঙল যার, জমি তার; ঘাম যার, দাম তার।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন

বঙ্গীয় বিধান সভা নির্বাচনে মুসলিম আসনের ফলাফল, ১৯৩৭

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা হার
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬	৩০.৭৬
মুসলিম লীগ	৩৫	২৯.৯১
স্বতন্ত্র (মুসলিম)	৪১	৩৫.০৪
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	০৫	৪.২৭
মোট	১১৭	৯৯.৯৮

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

এককভাবে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার হয়।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

- নির্বাচনী এলাকা: পটুয়াখালি
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী
- ১৯৩৭ সালে বাংলায় হককে মুখ্যমন্ত্রী করে হক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়

হক মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

- মন্ত্রিসভার সদস্য: ১১ জন (৬ জন মুসলিম + ৫ জন হিন্দু)
- মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী: এ কে ফজলুল হক
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: খাজা নাজিমউদ্দিন (মুসলিম লীগ সভাপতি)
- বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক)

একে ফজলুল হক এর মুসলিম লীগে যোগদান

- মন্ত্রীসভার স্থিতিশীলতা রক্ষায় ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে **শেরে বাংলা একে ফজলুল হক** মুসলীম লীগে যোগদান করেন।
- ফজলুল হক: প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি
- হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী: সাধারণ সম্পাদক
- ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে **একে ফজলুল হক** লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন।

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অবদান

- **ফ্লাউড কমিশন গঠন:** বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে প্রধান করে কমিশনটি গঠন করা হয়। ১৯৪০ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের আলোকে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে 'প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হয়।

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অবদান

- বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন পাস (এর মাধ্যমে সমগ্র প্রদেশে অসংখ্য ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করা হয়)
- পাট অধ্যাদেশ জারি।
- মুসলমানদের জন্য ৫০% চাকুরি নির্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থা হয়।
- বঙ্গীয় মহাজনী আইন প্রণয়ন। ফলে মহাজনদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা।

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অবদান

তেজগাঁও কৃষি ইনস্টিটিউট (বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

শিক্ষা বোর্ড বিল পাস

পল্লী উন্নয়নে থানা কর্মকর্তা নিয়োগ

মন্ত্রিসভার পতন (১৯৪১)

- ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জিন্নাহর সাথে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির কারণে মুসলিম লীগের ২১ জন সদস্য কোয়ালিশন ত্যাগ করে ফলে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা): ১৯৪১-৪৩

- ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করেন।
- তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির (হিন্দু মহাসভা) সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। এই মন্ত্রিসভারও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ কে ফজলুল হক।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন হয়।

নবযুগ

ফজলুল হক, মুজাফফর আহমেদ ও নজরুলের সাথে প্রকাশ করেন

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা

ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতনের পর গভর্নর কর্তৃক ১৯৪৩ সালে নাজিমউদ্দিন ১৩ সদস্যবিশিষ্ট এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়) এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেওয়া হয় **বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়**।

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

- ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বশেষ নির্বাচন।
- মুসলিম লীগ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পক্ষে 'গণভোট' বলে প্রচারণা চালায়। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে।
- মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেয়: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম।
- ১২২টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে- ১১৪টি

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় নির্বাচন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।
- গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ৩ জন

প্রথম মুখ্যমন্ত্রী— এ কে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)

দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী— খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)

তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী/শেষ মুখ্যমন্ত্রী— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)

ভারত ও পাকিস্তান ভাগের প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

দ্বিজাতি তত্ত্ব

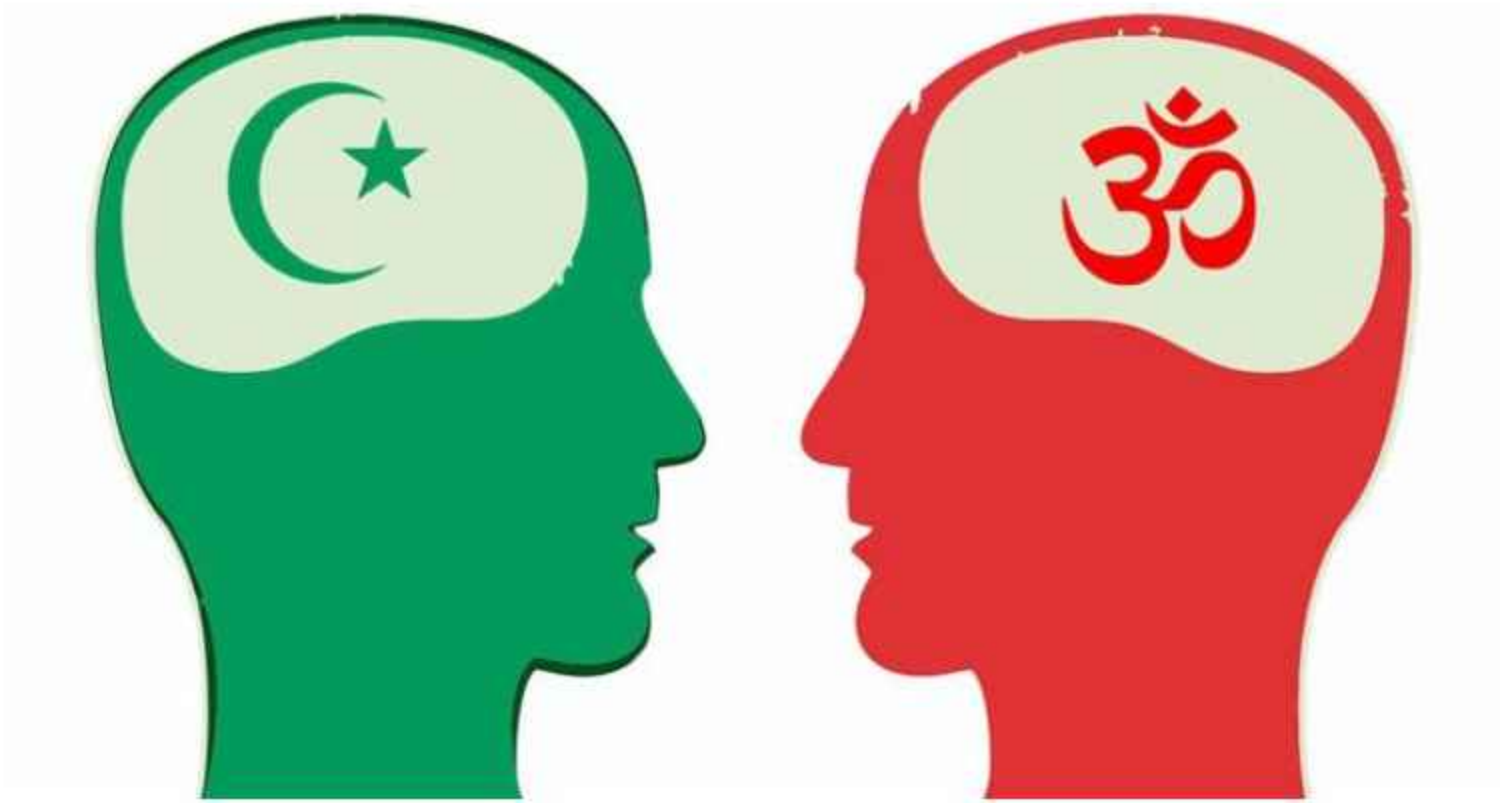

ইতিহাস

- **প্রারম্ভিক ধারণা (১৯শ শতক)**
  - ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান দুর্বল হতে থাকে।
  - স্যার **সৈয়দ আহমদ খান** প্রথম এই ধারণার বীজ বপন করেন। তিনি মনে করতেন হিন্দু ও মুসলমানের জীবনধারা, ধর্মবিশ্বাস ও ইতিহাস আলাদা — তাই তাদের স্বার্থও আলাদা।
  - ১৮৮৫ সালে যখন **ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস** গঠিত হয়, সৈয়দ আহমদ খান বলেন মুসলমানরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হবে।
- **আলিগড় আন্দোলন ও মুসলিম জাতীয় চেতনা**
  - স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলিগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে আহ্বান জানান।
  - মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক পরিচয়ের ধারণা শক্তিশালী হতে থাকে।

ইতিহাস

পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা (১৯০৯)

- **মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯)** এ প্রথমবারের মতো মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হয়।
- এটি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের রাজনৈতিক স্বীকৃতির প্রাথমিক ধাপ।

লখনৌ চুক্তি (১৯১৬)

- কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কিছু দাবি তোলে।
- মুসলমানদের জন্য পৃথক ভোটাধিকার কংগ্রেসও মেনে নেয়, যা দ্বিজাতি ধারণাকে আরও জোরদার করে।

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ও ১৯৩০-এর দশক

- হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের একাধিক নীতিতে মুসলমানদের মধ্যে আশঙ্কা জন্ম নেয়।
- ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল তার বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা উচিত।
- ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী "Pakistan" নামটি প্রস্তাব করেন।

ইতিহাস

- **লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)**
  - **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ** ও মুসলিম লীগ লাহোরে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যেখানে বলা হয় মুসলমানদের জন্য পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হবে।
  - এই প্রস্তাবই পরে পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি হয়।
- **পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭)**
  - অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত ভাগ হয়ে **পাকিস্তান** রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
  - পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) তখন একত্রে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিজাতি তত্ত্ব

- স্থান: লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশন
- সভাপতি ও উত্থাপক: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- তারিখ: ২৩ মার্চ, ১৯৩৯
- দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল কথা: হিন্দু-মুসলিম আলাদা রাষ্ট্র।

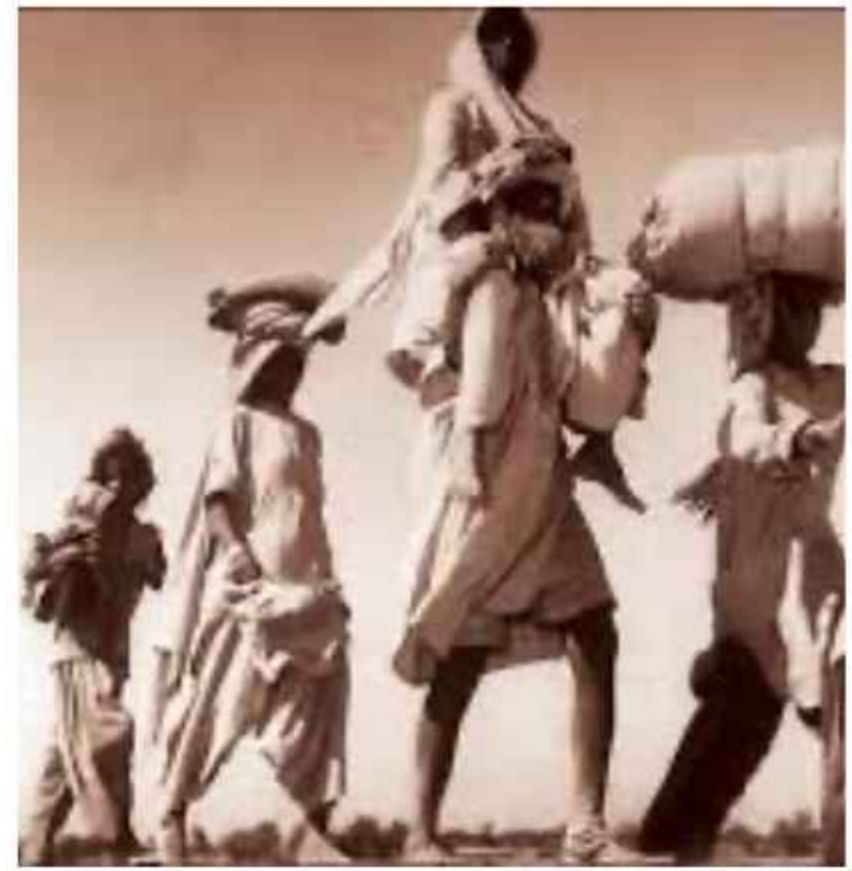

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাব

- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন।
- এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি

- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি ছিল: দ্বি-জাতি তত্ত্ব
- লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা বা বক্তব্য: উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন।

মূল লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন

- ৯ এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যদের একটি বিশেষ কনভেনশনে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) কথাটি সংশোধন করে 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' (Independent State) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাকিস্তানের জন্ম লাহোর প্রস্তাব নাকি দিল্লি প্রস্তাব?

- পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয় বরং ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। কারণ লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়েছিল।

ক্রিপস মিশন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ব্রিটিশ কেবিনেটের প্রভাবশালী মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ২২ মার্চ, ১৯৪২ সালে উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন তা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

ক্রিপস প্রস্তাব

- ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন হবে।
- ভারত ইউনিয়ন 'ডোমিনিয়ন' মর্যাদা পাবে।
- ফলাফল: ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলই ক্রিপস প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ না করায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারত ছাড় আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

ভারত ছাড়

আন্দোলন

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা

- ভারতীয় রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলি নিরসনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **এটলি ১৯৪৬** সালের **১৯** ফেব্রুয়ারি একটি মন্ত্রিমিশন গঠন করেন।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

- মন্ত্রিমিশন ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের পদ্ধতি প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এটাই মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

- মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্ট চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিরসনকল্পে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সিদ্ধান্ত নেয়।
- গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনা 'মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার আলোকেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করা হয়।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ভারত স্বাধীনতা আইন করা হয় ১৯৪৭ সালে।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

আইন পাস ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই

আইনটি পাস হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে

দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ

- র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমা নির্ধারণ কমিটি।
- ৯ আগস্ট ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফ তা ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন

ফলাফল

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

পাকিস্তানের জন্ম:
১৪ আগস্ট, ১৯৪৭

ভারত স্বাধীন হয়:
১৫ আগস্ট, ১৯৪৭

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- স্বাধীন ভারতের গভর্নর হন: লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- স্বাধীন পাকিস্তানের গভর্নর হন: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

চক্রবর্তী

রাজাগোপালাচারী:

ভারতের সর্বশেষ গভর্নর

জেনারেল

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

- ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। এরকম চরম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাসে 'বসু-সোহরাওয়ার্দী' প্রস্তাব নামে খ্যাত।
- ১৯৪৭ সালের ২৭শে এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন-সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

একজন সুভাষচন্দ্র বসু

- যখন দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army (INA)। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেসে আপোসকামী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন।

কতিপয় বিদ্রোহ

তেভাগা আন্দোলন: ইলা মিত্র

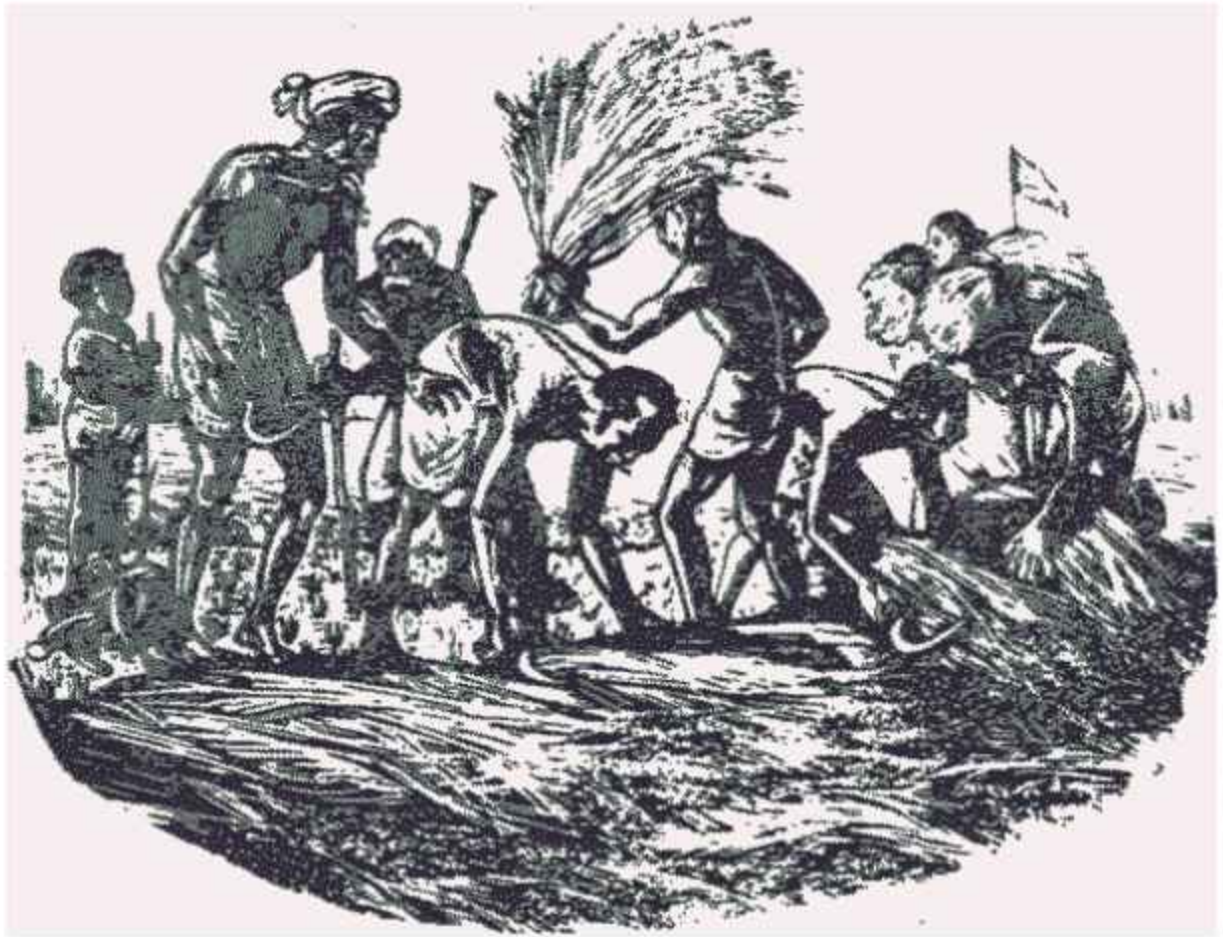

তেভাগা আন্দোলন

- তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর -এ শুরু হয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলে।
- আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও ইলা মিত্র।
- মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, এক ভাগ জমির মালিক এই দাবি থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ।
- দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

নাচোল বিদ্রোহ (১৯৪৯-৫০)

- নাচোল বিদ্রোহ- ১৯৪৯-৫০ সালে।
- বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নাচোল উপজেলার জোততারদের শোষণ ও চাষিদের অধিকার আদায়ে সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ।
- নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন- ইলা মিত্র

বৃহত্তর ময়মনসিংহ এর বিভিন্ন স্থানে টঙ্ক প্রথা চলে আসছিলো। টঙ্ক বলতে খাজনা বুঝানো হতো। কৃষকদেরকে উৎপাদিত শস্যের উপর এই টঙ্ক দিতে হতো। কিন্তু এর পরিমাণ ছিলো প্রচলিত খাজনার কয়েক গুনেরও বেশি।

টংক আন্দোলন করে

হাজংরা

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক

মুসলিম সাহিত্য সমাজ

- বাংলাদেশের মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। এটি ছিল বাংলাদেশের একটি বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের দল।
- মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধার ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মাত্র এক দশক চলেছিল এই ঢাকা কেন্দ্রিক গোষ্ঠীটির কার্যক্রম। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা। শিখার মুখবাণী ছিল-'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।
- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'- যে আন্দোলনের স্লোগান - বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি (১৯১১)

- বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি ১৯১১ সালে কলকাতায় অবস্থানরত মুসলমান ছাত্রদের গঠিত একটি সাহিত্য সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, মাওলানা আকরাম খাঁ, মৌলবি আবদুল করিম, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ সহ আরো অনেকে। এই সমিতির পত্রিকা ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- পরিচয়: বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ
- পিতা: নবাব খাজা আহসানউল্লাহ
- পিতামহ: নবাব খাজা আব্দুল গনি।

আহসান মঞ্জিল, ঢাকা

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা
- সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত ১৯০৬ সালে

হাজী মুহাম্মদ মহসিন

- বাংলার দানবীর বা বাংলার হাতেম তাই
- ১৭৩২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

- **ভারতের মুসলিম জাগরণের প্রথম অগ্রদূত**
- ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন
- **পরে ১৯২০ সালে এটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে** রূপান্তরিত হয়।
- আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি হয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত।

নওয়াব আব্দুল লতিফ

- কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলেন
- বাংলার প্রথম মুসলিম হিসেবে ১৮৬২ সালে বাংলার আইন পরিষদের সদস্য
- মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন

সৈয়দ আমীর আলী

- পেশায় ছিলেন: ব্যারিস্টার
- কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি
- লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য (ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের উপদেষ্টা কমিটি)
- ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা

সৈয়দ আমীর আলী

- তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন।
- ভারতের আইনে মুসলিম আইন প্রবর্তনে ভূমিকা পালন।
- বিখ্যাত গ্রন্থ
  - 'The Spirit of Islam'
  - 'A Short History of Saracens'

Thank You